গীতা-প্রবাহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ সহায়িকা

মূল উৎস → *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ – শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

সহায়ক উৎস → *সুবোধিনী – শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদের ভগবদ্গীতা টীকা।

*সারার্থ বর্ষিণী – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভগবদ্গীতা টীকা।

*গীতা ভূষণ – শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গীতা ভাষ্য।

*বিদ্বৎ রঞ্জন ও *রসিক রঞ্জন – শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতা ভাষ্যদ্বয়।

*আমার শরণাগত হও – শ্রীপাদ ভূরিজন দাস।

সংকলন - পদ্মমুখ নিমাই দাস

গোবিন্দ চরণ হৈতে, সুরধনী গঙ্গা যৈছে,
ধরণীতে প্রবাহিত হয়।
সে গোবিন্দের মুখ হৈতে, গীতার প্রবাহ তৈছে,
সাধু-সন্ত সভায় সদা বয়।।
সে প্রবাহের এক কণ, ডুবায় যে সর্বজন,
কেন ভাই ভাবিছ অন্যথা।
সে প্রবাহের এক বিন্দু, শুষ্ক করে ভব সিন্ধু,
অলৌকিক এ অদ্ভুত কথা।।
তাহে নিত্য স্নান করি, ওহে ভাই ভজ হরি,
শিরে ধরি তোমার চরণ।
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-বন্ধু লইয়া, সে প্রবাহে ডুব যাইয়া,
পদ্মমুখ করে নিবেদন।।

PADMAMUKHA NIMAI DAS

গীতা-প্রবাহ

তৃতীয় অধ্যায় – কর্ম-যোগ

অধ্যায় কথাসার

এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মসাধন ও তৎসাধ্য জ্ঞানের সগুণত্ব কথিত হয়েছে।
এই জড় জগতে প্রত্যেকেই কোনও ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু কর্ম সকল মানুষকে এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করতেও পারে, আবার তা থেকে মুক্ত করে দিতেও পারে। স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকে, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজের মাধ্যমে, মানুষ তার কাজের প্রতিক্রিয়া জনিত কর্মফলের বিধিনিয়ম থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্বের দিব্যজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এই অধ্যায়ের মূল-শিক্ষা

* কপটচারী কর্মসন্ন্যাসী না হয়ে একমাত্র ভগবৎ-সেবার জন্য নিষ্কামভাবে অখিল চেষ্টার দ্বারাই দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

* কামনাই সকল অনর্থের মূল। কৃষ্ণ কামের সেবার দ্বারা তা অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

এই অধ্যায় সম্পর্কে পূর্বাচার্য গীতা-ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত

*** শ্রীল শ্রীধর স্বামী →

অত্রোপায়ঃ কর্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।
হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্‌গুণত্বেন কীর্তিতঃ ॥
শ্রীহরিকর্তৃক এই অধ্যায়ে কর্মযোগই প্রধানত উপসংহৃত এবং জ্ঞানযোগও তদ্‌গুণরূপে কীর্তিত হয়েছে।

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

নিষ্কামমর্পিতং কর্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে।
কাম-ক্রোধ-জিগীষায়াং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে ॥
তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কামভাবে অর্পিত কর্মের বিস্তারিত বর্ণন হবে ও কাম-ক্রোধ জয়ে অভিলাষী ব্যক্তির বিবেক প্রদর্শিত হবে।

*** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →

তৃতীয়ে কর্ম নিষ্কামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্।
কামাদের্বিজয়োপায় দুর্জয়স্যাপি দর্শিতঃ ॥
তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম সম্বন্ধে অতিশয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতিশয় দুর্জয় (অবাধ্য) কামাদিকেও কিরূপে জয় করা যায়, তাও দেখান হয়েছে।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে জড় জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন-সেই পথ হচ্ছে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা। কখনও এই বুদ্ধিযোগের কদর্থ করে একদল নিষ্কর্মা লোক কর্ম-বিমুখতার আশ্রয় গৃহণ করে। কৃষ্ণভাবনার নাম করে তারা নির্জনে বসে কেবল হরিনাম জপ করেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দুরাশা করে। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ না করে নির্জনে বসে কৃষ্ণনাম জপ করলে নিরীহ, অজ্ঞ লোকের সস্তা বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। অর্জুনও প্রথমে বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার নামান্তর বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনা ও তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভাবনার অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো যখন তিনি তাঁর গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনান।

অধ্যায় সঙ্গতি

বুদ্ধিযোগকে কর্মত্যাগ বলে ধরে নিয়ে অর্জুন কৃষ্ণের বাক্যকে দ্ব্যর্থবোধক বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দ্বিধা দূর করেন।

অধ্যায় রূপরেখা

শ্লোক ১-২ – অর্জুনের প্রশ্ন – কর্ম কিংবা কর্মত্যাগ
শ্লোক ৩-৯ – কৃষ্ণের উত্তর – নিষ্কাম কর্মযোগ
শ্লোক ১০-১৬ – কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ
শ্লোক ১৭-৩৫ – নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন
শ্লোক ৩৬-৪৩ – জীবের চিরশত্রু কাম

শ্লোক ১-২ – অর্জুনের প্রশ্ন – কর্ম কিংবা কর্মত্যাগ

শ্লোক ১-২ — যদি তোমার মতে মোক্ষের অন্তরঙ্গতা হেতু কর্ম হতে বুদ্ধি অধিকতর শ্রেষ্ঠা হয়, তবে কি জন্য ''তস্মাদ্ যুধ্যস্ব'' – 'অতএব যুদ্ধ কর', ''তস্মাদুত্তিষ্ঠ''-'অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।' ইত্যাদি বারবার বলে ঘোরহিংসাত্মক কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত করছ?

অর্জুনের প্রশ্ন – অর্জুন বললেন- হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তা হলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছ? তুমি যেন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছ। তাই, দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বল কোন্‌টি আমার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়স্কর।

শ্লোক ৩-৯ – কৃষ্ণের উত্তর – নিষ্কাম কর্মযোগ

শ্লোক ৩ — এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন — আমি যদি এরকম বলতাম যে, "মোক্ষ লাভ করার জন্য পরস্পর নিরপেক্ষ কর্ম ও জ্ঞানযোগরূপ দুটি নিষ্ঠা আছে," তাহলে "এই দুটির মধ্যে কোনটি শুভ, তা বল" তোমার এই প্রশ্নটি সঙ্গত হত; কিন্তু আমি ত' সেরূপ বলিনি। ঐ দুটি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্টাই উক্ত হয়েছে –

দুই প্রকার মানুষ – পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

শ্লোক ৪ — অতএব সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া পর্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসকল করা কর্তব্য, অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না, এটিই বলছেন —

কর্মের প্রয়োজনীয়তা – কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

শ্লোক ৫ — কর্মসকলের সন্ন্যাস বলতে কর্মে অনাসক্তি বুঝতে হবে; কিন্তু স্বরূপতঃ কর্মের ত্যাগ নয়, যেহেতু তা অসম্ভব, এটিই বলছেন —

কর্মত্যাগ অসম্ভব – সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়, তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।

শ্লোক ৬ — এজন্য অজ্ঞ কর্মত্যাগীকে নিন্দা করছেন —

মিথ্যাচারী ভণ্ড কর্মত্যাগী – যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭ — কিন্তু এরকম মিথ্যাচারীর বিপরীত কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ, এটিই বলছেন —

শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী – কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৮ — এখন অর্জুনের কি কর্তব্য তা বলছেন –

শাস্ত্রোক্ত কর্ম – তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।

শ্লোক ৯ — সাংখ্যবাদীরা বলেন — সকল কর্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম করা উচিত নয়। এই মত খণ্ডন করে বলছেন —

বিষ্ণু-সন্তুষ্টিই কর্মের উদ্দেশ্য – বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ। তাই, হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

শ্লোক ১০-১৬ – কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ

শ্লোক ১০ — প্রজাপতির বাক্য হতেও কর্মিগণ অকর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এটিই চারিটি শ্লোকে বলছেন —

যজ্ঞের দ্বারা অভীষ্টপূর্তি – সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা যজ্ঞাদিসহ প্রজাসকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন- "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করবে।"

শ্লোক ১১ — যজ্ঞ কিভাবে অভীষ্ট কাম্যফল প্রদান করে, তা-ই বলছেন —

দেবতা ও মানবের পরস্পর প্রীতি সম্পাদন – তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন। এভাবেই পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।

শ্লোক ১২ — কর্ম না করলে, কি দোষ হয় ? —

চোর – যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

শ্লোক ১৩ — অতএব যজ্ঞকারীরাই শ্রেষ্ঠ, অন্যরা না, এটিই বলছেন —

পাপ ভোজন – ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবিশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

শ্লোক ১৪-১৫ — সংসারচক্র প্রবর্তনের কারণ বলেও কর্ম করা কর্তব্য, এটিই বলছেন –

যজ্ঞচক্র – অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভুত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্লোক ১৬ — যেহেতু এই প্রকারে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা জীবগণের পুরুষার্থ – সিদ্ধির জন্য কর্মাদিচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, সেহেতু যে কর্ম করে না, তার জীবনই বৃথা, এটিই বলছেন —

যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির আবস্থা – হে অর্জুন! যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

শ্লোক ১৭-৩৫ – নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন

শ্লোক ১৭ — এভাবে অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য কর্মযোগের কথা বলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অনুপযোগী এটিই দুটি শ্লোকদ্বারা বলছেন —

কার কোন কর্ম নেই? – কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই।

শ্লোক ১৮ — এখন তার কারণ বলছেন —

আত্মানন্দী – আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির এই জগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই প্রকার কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। তাকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

শ্লোক ১৯ — যেহেতু উক্ত আত্মরতি জ্ঞানীর পক্ষেই কর্মের উপযোগীতা নেই, অপরের পক্ষে কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেহেতু তুমি সেরূপ জ্ঞানী নও বলে কর্ম কর, এটিই বলছেন —

অর্জুনের কর্তব্য – অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২০ — এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দেখাচ্ছেন —

দৃষ্টান্ত স্থাপন – জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।

শ্লোক ২১ — শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ম করলে অজ্ঞগণও স্বধর্ম প্রতিপালন করে, তা-ই বলছেন —

শ্রেষ্ট ব্যক্তিই অনুসরণীয় – শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

শ্লোক ২২ — 'এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত' এটিই শ্রীভগবান তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন —

ভগবানও কর্ম করেন – হে পার্থ! এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই। তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।

শ্লোক ২৩ — কর্ম অনুষ্ঠান না করলে লোকের নাশ ঘটে থাকে, তা-ই দেখাচ্ছেন—

ভগবান কেন কর্ম করেন – হে পার্থ! আমি যদি অনলস হয়ে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে আমার অনুবর্তী হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে।

শ্লোক ২৪ — তাতে কি ঘটে?

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট – আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে। আমি বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কারণ হব এবং তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

শ্লোক ২৫ — সেজন্য আত্মজ্ঞ পুরুষও লোকশিক্ষার জন্য জনসমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কর্ম করে থাকেন, এটিই বলছেন —

কার কর্মের উদ্দেশ্য কি – হে ভারত! অজ্ঞানীরা যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, তেমনই জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন।

শ্লোক ২৬ — অর্জুন যদি বলেন, "কৃপা করে অজ্ঞদের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেয়াই যুক্তিসঙ্গত।" তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন — "না, তা নয়" —

জ্ঞানবান ব্যক্তিদের অনুচিৎ কার্য – জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না। বরং তাঁরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।

শ্লোক ২৭ — অর্জুন যদি বলেন, "জ্ঞানীগণেরও কর্ম করা কর্তব্য, তা হলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য কি?" এটি আশঙ্কা করে উভয়ের পার্থক্য দেখাচ্ছেন দুটি শ্লোক দ্বারা —

অজ্ঞানীদের মনোভাব – অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'- এই রকম অভিমান করে।

শ্লোক ২৮ — কিন্তু জ্ঞানীরা সেরূপ মনে করে না, এটিই বলছেন —

জ্ঞানীদের মনোভাব – হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যে প্রবৃত্ত হন না।

শ্লোক ২৯ — উপসংহার –

মূর্খকে সদুপদেশ দিতে নেই – জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের কর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচলিত করেন না।

শ্লোক ৩০ — অতএব উক্ত প্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম করা কর্তব্য, তুমি কিন্তু এখনও তত্ত্ববিৎ হও নি, অতএব তুমি কর্মই কর, এটিই বলছেন —

অর্জুনের কর্তব্য – অতএব, হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর এবং মমতাশূন্য, নিষ্কাম ও লোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

শ্লোক ৩১ — উক্তরূপ কর্ম অনুষ্ঠানের ফল বলছেন —

ভগবানের নির্দেশ অনুসরণের ফল – আমার নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত মানুষ তাঁদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যারা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্য রহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৩২ — অন্যথা আচরণের পরিণতি বলছেন —

ভগবানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার ফল – কিন্তু যারা অসূয়াপূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না, তাদেরকে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, বিমূঢ় এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে।

শ্লোক ৩৩ — অর্জুন যদি বলেন, "তবে কেন সেই মহাফল লাভ করার জন্য ইন্দ্রিয় দমন করে নিষ্কাম হয়ে সকলেই স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে না?" এর উত্তরে বলছেন —

সকলেই স্বভাবের অনুগামী – জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

শ্লোক ৩৪ — অর্জুন যদি বলেন, "জীবের প্রবৃত্তি তার প্রকৃতিরই অধীন হয়, তবে তার জন্য বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থ হয়।" এই আশঙ্কায় শ্রীভগবান বলছেন —

প্রতিবন্ধক – সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে আসক্তি অথবা বিরক্তি অনুভব করে, কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ তা পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ৩৫ — পশু প্রভৃতির ন্যায় পূর্বোক্ত প্রকার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে স্বধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য — এটি বলা হয়েছে, কিন্তু তা হলে ক্ষত্রিয়ধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলে যথাবিধি তা সম্পন্ন করতে অক্ষম, আর পরধর্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তার ধর্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাতে প্রবর্তিত হতে ইচ্ছুক অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবান বলছেন —

স্বধর্মই পালনীয় – স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

শ্লোক ৩৬-৪৩ – জীবের চিরশত্রু কাম

শ্লোক ৩৬ — "রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না, এটি বলা হয়েছে, কিন্তু তা অসম্ভব" — এটি মনে করে অর্জুন বললেন –

পাপের প্রেরণা কি? – অর্জুন বললেন- হে বার্ষ্ণেয়! মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

শ্লোক ৩৭ — অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন –

কামই মূল শত্রু – পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক, কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

শ্লোক ৩৮ — কামের বৈরিত্ব দেখাচ্ছেন –

দৃষ্টান্ত – কামরূপী আবরণ – অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পন যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

শ্লোক ৩৯ — কামের বৈরিত্ব আরও পরিস্ফুট করছেন —

দৃষ্টান্ত – কাম চিরঅতৃপ্ত – কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

শ্লোক ৪০ — এখন সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলে তাকে জয় করার উপায় দুটি শ্লোকে বলছেন —

কামের আশ্রয়স্থল – ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থল। এই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

শ্লোক ৪১ — যেহেতু কাম এ প্রকার, সেহেতু বলছেন —

অর্জুনের কর্তব্য – অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপের প্রতীকরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

শ্লোক ৪২ — যে স্থানে চিত্তপ্রণিধান করলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে পারা যায়, সেই আত্মার স্বরূপ দেহাদি হতে পৃথক করে দেখাচ্ছেন —

আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব – স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়, আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

শ্লোক ৪৩ — এখন উপসংহার করছেন –

কাম জয়ের উপায় – হে মহাবীর অর্জুন! নিজেকে জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির কর এবং এভাবেই চিৎ-শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

সংক্ষেপে কাম সম্বন্ধে এ পর্যন্ত (৩৬-৪৩) যা বলা হয়েছে –

এটি কি? – জীবের প্রধান শত্রু

– সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক

– দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত (দৃষ্টান্ত – দুর্বারিত অগ্নির মতো)

– জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক

– পাপের প্রতীকরূপ

এর জন্ম কিভাবে? – রজোগুণ থেকে সমুদ্ভত।

এর পরিণতি কি? – কামই ক্রোধে পরিণত হয়।

এর কার্যপ্রণালী কি? – জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এর দ্বারা আবৃত থাকে। ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

দৃষ্টান্ত – ধূম দ্বারা অগ্নি আবৃত, ময়লার দ্বারা দর্পন আবৃত, জরায়ুর দ্বারা গর্ভ আবৃত।

এর আশ্রয়স্থল কোথায়? – ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি।

একে কিভাবে জয় করা যায়? – নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করতে হবে।

অধ্যায় উপসংহার

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্মণঃ।
প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্॥
এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম-সাধন এবং তৎসাধ্য জ্ঞানের সগুণত্ব কথিত হল।

*** শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর →

পূর্ব অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে অর্জুনের মনে এই সংশয় হল যে, যদি কর্ম উপায় মাত্র হয়ে উপেয়স্বরূপ আত্ম-যাথাত্ম্যবুদ্ধি উৎপাদন করে, তবে একেবারেই সে বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল। এই সংশয় দুর করার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড় দেহ প্রাপ্ত জীবের কর্মের অপরিহার্যতা, যুক্ত কর্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি সাধকতা, স্বধর্ম অকারতা, অকর্ম বিকর্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত কাম জয়ের একমাত্র উপায়তা প্রদর্শনপূর্বক, ভগবদ্ অর্পিত রূপে কর্ম যোগেরই সাধন কর্তব্য, ইহা স্থির হল। অপক্ক অবস্থায় কর্ম সন্ন্যাস শমদমাদির পৃথক চেষ্টা নিষ্ফলতার বিচারও হয়েছে।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →

ভগবদ্গীতার এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের স্বরুপ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যকালের দাস, সেই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ হবার ফলে আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে একাগ্র করতে পারি। এটিই হচ্ছে এই অধ্যায়ের মর্মার্থ।